ফিকহুজ জিহাদ বা জিহাদের বিধান

লেখক: ইউসুফ আল-কারযাভী, প্রকাশক: ওহাবা বুকসপ, প্রকাশ: ২০০৯, পৃষ্ঠা: ১৪৩৯।

ড. ইউসুফ আল-কারযাভীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলোর একটি হচ্ছে 'ফিকহুজ জিহাদ' বা 'জিহাদের বিধান'। এটি এখনো ইংরেজি বা বাংলায় অনুদিত হয়নি। তবে বইয়ের সারসংক্ষেপ ইন্টারনেটে পাওয়া যায়। এ গ্রন্থের ওপর আরেকজন বড় ইসলামি চিন্তাবিদ তিউনিশিয়ার ড. রশদি আল ঘানুসি ২০০৯ সালে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি দীর্ঘ বক্তব্য পাঠ করেন। এটিও ইন্টারনেটে পাওয়া যায় (shoncharon.com দেখুন)। এ প্রবন্ধ থেকেই আমি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো নিচে তুলে ধরেছি।

ড. কারযাভী জিহাদ সম্পর্কে গবেষণা করতে যে পদ্ধতি গ্রহণ করেন তা নিম্নরূপ:

১. কুরআন ও সম্পূর্ণভাবে নির্ভুল সুন্নাহ্‌র ওপর নির্ভর করা। দুর্বল কোনো প্রমাণ গ্রহণ না করা।

২. ইসলামের ব্যাপক ফিকাহ সাহিত্যের সাহায্য গ্রহণ করা। কোনো বিশেষ মাজহাবের প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করা। তারপর সবচেয়ে উপযুক্ত মত গ্রহণ।

৩. ইসলামের সাথে অন্যান্য ধর্মের এবং আইন ব্যবস্থার তুলনামূলক অধ্যয়ন করা।

৪. দাওয়া, শিক্ষাদান, রিসার্চ, ফতোয়া, সংস্কার ও পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে 'ওয়াসতিয়া' বা মধ্যপন্থা গ্রহণ করা। আজকের সমস্যার সমাধানে ইজতিহাদকে ব্যবহার করা; যেমন- পূর্বকালে সে যুগের ফকিহগণ তাদের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে করেছিলেন।

জিহাদের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন: জিহাদ ও কিতাল (যুদ্ধ)-এর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। মক্কাতেই জিহাদের আয়াত নাজিল হয়। কিন্তু তখন কিতাল ছিল না। তখন জিহাদ ছিল দাওয়ার। ড. কারযাভী ইবনে তাইমিয়ার ছাত্র ইবনুল কাইয়িমকে উল্লেখ করে বলেন, কিতাল ছাড়াও জিহাদের ১৩টি পর্যায়ে রয়েছে। জিহাদ বিল নাফসের চারটি পর্যায়, শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদের দুটি পর্যায়, মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদের চারটি পর্যায় এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে জিহাদের তিনটি পর্যায় (হাত দ্বারা, মুখ দ্বারা এবং অন্তর দ্বারা) রয়েছে।

ড. কারযাভী আধুনিককালে পার্টি, পার্লামেন্ট, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মাধমে অত্যাচার বন্ধ করার প্রচেষ্টাকেও জিহাদ বলছেন। তিনি নানা পদ্ধতিতে সাংস্কৃতিক জিহাদের কথাও বলেছেন (ইসলামি সেন্টার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি)।

জিহাদের লক্ষ্য সম্পর্কে তিনি বলেন, ইসলাম আত্মরক্ষামূলক জিহাদের কথা বলেছে। যদিও পূর্বে আক্রমণাত্মক জিহাদের পক্ষেও অনেকে বলেছেন। তিনি মনে করেন, আমাদের পূর্বের ফকীহরা যে আক্রমণাত্মক জিহাদের কথা বলেছেন, তার ভিত্তি কুরআন বা সুন্নাহ্ নয় বরং তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা। তখন সব রাষ্ট্র পরস্পর সঙ্ঘাতে লিপ্ত ছিল। কোনো সর্বস্বীকৃত আন্তর্জাতিক আইন ছিল না।

তিনি এ প্রসঙ্গে আলো বলেন-

১. সুরা তাওবায় মুশরিকদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে, তা সাধারণ আদেশ ছিল না। সেটা ছিল আরব মুশরিকদের একটি দলের বিরুদ্ধে।

২. সামরিক জিহাদ সালাত ও সিয়ামের মতো সবার ওপর ব্যক্তিগত ফরজ নয়। ব্যক্তিগত জিহাদের কথা সুরা বাকারা, সুরা আনফাল, সুরা মুমিনুল, সুরা রাদ, সুরা লুকমান, সুরা ফুরকান বা সুরা জরিয়াতে মুত্তাকিদের গুণাবলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

৩. যদি মুসলিমরা নিরাপদ থাকে তাহলে অমুসলিম রাষ্ট্রকে আক্রমণ করা বৈধ নয়।

৪. ইসলাম ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা স্বীকার করে।

৫. ইসলাম আন্তর্জাতিক আইনের প্রণয়ন, জাতিসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাকে স্বাগত জানায়। মুসলিমরা আন্তর্জাতিক আইন স্বীকার করে নেয়ায় এখন অন্য কোনো রাষ্ট্রের ওপর হামলার কোনো বৈধতা নেই।

ড. কারযাভী বলেন: বর্তমান অমুসলিম বিশ্বকে দারুল আহাদ (চুক্তিবদ্ধ দেশ) মনে করতে হবে। কেননা সব দেশেই এখন জাতিসঙ্ঘের আওতায় নানা চুক্তিতে আবদ্ধ।

ড. কারযাভী আরো বলেন, ইরহাব বা সন্ত্রাস আর জিহাদ এক নয়। সব ধরনের সন্ত্রাস ইসলামে নিষিদ্ধ। এর ব্যতিক্রম শুধু ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা সংগ্রাম বা এ ধরনের স্বাধীনতা সংগ্রাম। এরপর তিনি ইসলামে জিহাদ বা যুদ্ধে যেসব নৈতিক নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে তার আলোচনা করেন।

১. যুদ্ধে অবৈধভাবে শত্রুকে প্রলোভিত করার জন্য অবৈধ পন্থা; যেমন মদ বা যৌনতা (Sex) ব্যবহার করা যাবে না।

২. প্রথমে আক্রমণ করা যাবে না; যেমন- কুরআনের ২: ১৯০ আয়াতে বলা হয়েছে।

৩. চুক্তি রক্ষা করতে হবে।

৪. দালানকোঠা নষ্ট করা এবং গাছ ও ফসল কাটা যাবে না।

৫. আণবিক ও রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ; কেননা এতে যারা যোদ্ধা নন তারাও নিহত হন। আশা করি, বর্তমান প্রেক্ষিতে জিহাদের বিভিন্ন দিক এ লেখায় সুস্পষ্ট হয়েছে।

শাহ্ আব্দুল হান্নান
সাবেক সচিব, বাংলাদেশ সরকার
E-mail: shah_abdul_hannan@yahoo.com

ইসলামি শরিয়াহ: লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (প্রথম খণ্ড)

লেখক: ড. ইউসুফ হামিদ আল আলিম (১৯৩৭-১৯৮৮), অনুবাদ: প্রফেসর মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, প্রকাশক: বিআইআইটি, প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ২০১৪, আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৮৪৭১-৩৪-০, পৃষ্ঠা: ৩৬৪

বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার ড. ত্বাহা জাবির আল্ আলওয়ানী লিখিত একটি দীর্ঘ ভূমিকা গ্রন্থটির অবস্থানকে সমুন্নত করেছে এবং পাঠকের জন্য তা বুঝা সহজ করে দিয়েছে। গ্রন্থটির লেখক একজন প্রথিতজশা গবেষক এবং একজন প্রাজ্ঞ শিক্ষাবিদ হিসেবে কালের চাহিদাকে সামনে রেখে উল্লিখিত শিরোনামে তা স্বার্থকভাবেই রচনা করেছেন। তিনি নিয়মতান্ত্রিকতা রক্ষা করেই একটি সুবিন্যাস্ত সূচি এবং সমৃদ্ধ গ্রন্থপঞ্জি উপস্থাপন করেছেন, যা তার এ বিষয়ে সুগভীর অধ্যবসায়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এর মধ্য দিয়ে বিজ্ঞ লেখক আমাদেরকে এ কথা যথাযথই মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কলম ধরতে কী ধরণের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়, অর্থাৎ গ্রন্থটিতে তিনি ইসলামি শরিয়ার মৌলিক উৎস থেকেই নানা তথ্য উপাত্ত সন্নিবেশিত করেছেন। সাথে সাথে তাঁর নিজের মেধা ও প্রজ্ঞাকে ব্যবহার করেছেন। তাই গ্রন্থটির প্রকাশক প্রকৃত অর্থেই বাংলা ভাষায় ইসলামের মৌলিক জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান জ্ঞানভাণ্ডারকে সংযুক্ত করেছেন।

এ পর্যায়ে সম্মানিত পাঠককে গ্রন্থটির সাথে সংক্ষেপে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই এভাবে যে-

গ্রন্থটিতে লেখক তাঁর মূল বক্তব্যকে চারটি আলোচ্য বিষয় আকারে উপস্থাপন করেছেন। প্রথম আলোচ্য বিষয়: বিষয় পরিচিতি, শরিয়াহ বিধানের সংজ্ঞা এবং শরিয়াহ বিধানের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের বর্ণনা, দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়: ইসলামি শরিয়াহর সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ, তৃতীয় আলোচ্য বিষয়: ইসলামি শরিয়াহর উৎসসমূহ অথবা বিধানাবলির যুক্তির ভিত্তি, চতুর্থ আলোচ্য বিষয়: দ্বীনের কল্যাণ সংরক্ষণের ঋণাত্মক পদ্ধতি। এ সকল আলোচ্য বিষয়ভিত্তিক ও অনুচ্ছেদ আকারে উল্লেখ করেছেন। সবমিলিয়ে গ্রন্থটির সূচি বিন্যাসে একটু ভিন্নতা ও সবিস্তার বর্ণনারীতি অনুসরণ করা হয়েছে বলেই প্রতীয়মান হয়।

আমি মনে করি, গ্রন্থটি সুখপাঠ্য এবং একই সাথে এটি অত্যন্ত উচ্চমানের একটি গবেষণাকর্ম। পাঠককে চিন্তাশীল ও গবেষণামনস্ক করতে গ্রন্থটির জুড়ি নেই। দ্বীনি জ্ঞানচর্চায় গতানুগতিকতাকে পরিহার করে অনুসন্ধিৎসু এবং তুলনামূলকভাবে অধ্যয়নের অভ্যাস গড়তে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করবে। পাঠকের মাঝে সৃজনশীলতা সৃষ্টিতেও যথেষ্ট ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে বিশ্বাস করি। তাই বলা যায়, গ্রন্থটি মূলত গবেষক, চিন্তাশীল লেখক এবং ইসলামি শরিয়াহ সম্পর্কে ভাবতে ইচ্ছুক এমন পাঠকদের জন্য লিখিত। তবে এখানে সাধারণ পাঠকদের খোরাক যে নেই, তা বলছি না। বরং তাদের কাছে এর বিষয় বিন্যাস, উপস্থাপন কৌশল এবং সন্নিবেশিত তথ্য-উপাত্তকে তুলনামূলক কঠিন মনে হতে পারে।

সবচেয়ে বড় বিষয় এই যে, মুসলিম উম্মাহর একটি বড় অংশ তাদের দ্বীনকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হচ্ছে না, এর কল্যাণকামিতা সম্পর্কে একেবারেই ওয়াকিবহাল নয়। কারণ তারা দ্বীন পালন করে অন্ধের মত, এর পিছনে কী দলিল আছে বা এর দুনিয়ার কল্যাণ কী কী নিহিত আছে তা জানার ইচ্ছাটাই হারিয়ে ফেলেছে। তারা বিশ্বাস করে যে, দ্বীন ও দুনিয়া পৃথক বিষয়। দ্বীন পালন করতে হবে কেবল আখিরাতের জন্য। দুনিয়াতে এর কোনো প্রতিদান আশা করা সঠিক নয়। অথবা ইসলামি শরিয়াহর বিধানের দলিল খুঁজতে যাওয়া খুব একটা জরুরি নয়, আর তা বিভ্রান্তির কারণ হতে পারে। অথচ ইসলামি শরিয়াহ নিজেই তার অনেক বিধানের কারণ ব্যাখ্যা করেছে, উদ্দেশ্য লক্ষ্যকে বিবৃত করেছে, যেন মানুষ তা উপলব্ধি করে আমল করতে পারে। সাথে সাথে এ নিয়ে চিন্তা গবেষণার জন্য

আহবান করেছে। কখনও বা তিরষ্কার করেছে দ্বীন নিয়ে চিন্তা গবেষণা থেকে বিরত থাকার জন্য। এমনই এক প্রেক্ষাপটে উম্মাহর মাঝে অন্ধ অনুকরণে জন্ম নিয়েছে এবং ইজতিহাদের প্রবণতায় ভাটা পড়েছে।

বিজ্ঞ লেখক তাঁর গোটা লেখনিতেই যে সত্যটিকে বুঝাতে চেয়েছেন, তা হলো- ইসলামি শরিয়াহয়-এ কোনো অকল্যাণকর কিছু নেই, থাকতে পারে না। তিনি বলেছেন, শরিয়াহর কর্তৃত্ব বেশি করে মেনে নেয়ার ওপরই মানুষের মর্যাদা নির্ভরশীল। ইসলামে কখনই মানবমর্যাদা নিছক মানবিক চিন্তাপ্রসূত বা বুদ্ধিবৃত্তি ও জাতীয় মর্যাদার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে না, বরং ব্যক্তির কথায়, কর্মে ও বিশ্বাসে শরিয়াহর বিধানসমূহ মেনে চলার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। অর্থাৎ মানুষের মর্যাদা তাকওয়ার ওপর নির্ভরশীল। মুহাম্মদ সা. ছিলেন আল্লাহ তায়ালার ওহির হুকুমের প্রবক্তা, তার সর্বাধিক অনুগত এবং সে অনুযায়ী নিজেকে পরিচালিত করতে সবসময় প্রস্তুত। তিনি আল্লাহর দেয়া শরিয়াহকে নিজের শাসকে পরিণত করেছিলেন এবং তার নির্দেশ অনুযায়ীই জীবনের সকল পথ পাড়ি দেন।

লেখক অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণভাবে গ্রন্থটিতে একাধারে ইসলামি শরিয়াহর শাব্দিক পারিভাষিক অর্থ, উদ্দেশ্য-লক্ষ্য, বৈশিষ্ট্য, উৎসসমূহ, তার বিধিবিধান ও তার কল্যাণকামিতা, প্রতিবন্ধকতা ও তা উত্তোরণের উপায় এবং কৌশল নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ ছাড়া ইসলামের মৌলিক ইবাদাত সালাত, যাকাত, সওম ও হাজ্জ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সবশেষে ইসলামি শরিয়াহতে জিহাদের বিধান নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি এখানে জিহাদের একটি সার্বজনীন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। আবার গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে তিনি নিজেই প্রশ্নের অবতারণা এবং তার উত্তর প্রদানের মাধ্যমে পাঠককে বুঝতে সহযোগিতা করেছেন। দ্বীনের মধ্যে বিদায়াত সৃষ্টির অপকারিতা এবং তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন।

সব মিলিয়ে আমি বিশ্বাস করি, সময়ের দাবি অনুযায়ী গ্রন্থটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বিশেষ করে চিন্তাশীল পাঠকদের জন্য এটি অত্যন্ত সহায়ক একটি গাইড গ্রন্থ হতে পারে। দ্বীনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করে তা জানা ও মানার জন্য এটি জরুরি। তবে গ্রন্থটিতে বিষয় উপস্থাপন এবং তার সুক্ষ্ম তত্ত্বের বিশ্লেষণ ভঙ্গির গাম্ভীর্যের কারণে কোনো পাঠকের জন্য তা একাধিকবার পাঠ করা প্রয়োজন হতে পারে। তবে দুর্বোধ্য বলার কোনো সুযোগ নেই। পরবর্তী সংস্করণে অনুবাদক মূলের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে ভাষাকে কিছুটা সহজতর করতে চেষ্টা করলে আরো সুখপাঠ্য হবে বলে মনে করি।

গাড়ো সবুজের সুন্দর কাভারে সজ্জিত, পরিচ্ছন্ন ছাপায় উপস্থাপিত তত্ত্ব ও তথ্যে ভরপুর অনুসন্ধিৎসু পাঠক সৃষ্টিতে সহায়ক এ গ্রন্থটির আমি বহুল প্রচার ও প্রসার কামনা করছি। একই সাথে লেখক, অনুবাদক ও প্রকাশের সাথে জড়িত সকলের জন্য মহান রবের নিকট যথাযথ প্রতিদান কামনা করছি। আমীন! ছুম্মা আমীন!

মীর মনজুর মাহ্‌মুদ *পিএইচ. ডি.*
গবেষক, লেখক
E-mail: monjur.nubd @ gmail.com.

কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা

লেখক: প্রফেসর ড. মাহ্‌ফুজুর রহমান, প্রকাশক: বিআইআইটি, প্রথম প্রকাশ: আগস্ট ২০১৪, আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৮৪৭১-০৭-৪, পৃষ্ঠা: ২০৬

গুরুত্বপূর্ণ এই গ্রন্থটিকে লেখক মোট চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন, প্রথম অধ্যায়ে তিনি সফলতার সাথে ইসলামি ব্যাংকের পরিচয়, সংজ্ঞা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে এবং প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত বিষয়গুলো উপস্থাপন করেন। তাছাড়া এই অধ্যায়ে তিনি ইসলামি ব্যাংক ও সুদি ব্যাংকের পার্থক্য তুলে ধরেন। এখানে যথাযথভাবে এ ব্যাংকে ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়েও আলোচনা করেন এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় সুপারভাইজারি বোর্ডের রূপরেখাগুলোর বর্ণনা দেন। এতদসংক্রান্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রতিভাত হয় যে, শুধু মুনাফা অর্জন এবং গ্রাহক সেবাই ইসলামি ব্যাংকের উদ্দেশ্য নয়। দারিদ্র্য বিমোচন, বিনিয়োগ, গণমূখী নীতি প্রবর্তন ও কল্যাণ তহবিল প্রতিষ্ঠা করাও এর উদ্দেশ্য। তিনি মনে করেন ইসলামি ব্যাংকের ভূমিকা জাতীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। বরং মুসলিম বিশ্বের অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করতে অবদান প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় লিপ্ত থাকতে পারে।

অতঃপর দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি ইসলামি ব্যাংকসমূহের তহবিলের উৎস নিয়ে আলোচনা করেন। এখানে প্রথমে উদ্যোক্তা শেয়ার হোল্ডারদের যোগান দেওয়া মূলধনের ওপর আলোকপাত করেন, এ ক্ষেত্রে বিবর্তন এবং বিবর্তনের আলোকে সাম্প্রতিক ধারাগুলো তিনি তুলে ধরতে ভুলে যাননি। তিনি ইসলামি শরিয়াহর আলোকে মুশারাকার ভিত্তিতে পরিচালকবৃন্দের যোগান দেওয়া অর্থের অবস্থান সম্বন্ধে স্পষ্ট বক্তব্য তুলে ধরেন, অতঃপর বিভিন্ন ধরনের হিসেবের বর্ণনা দেন। যেমন: আল ওয়াদিয়া চলতি হিসাব ও মুদারাবা হিসাব। মুদারাবা হিসাবের আলোচনা দীর্ঘায়ীত করে তিনি বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন, কারণ মুদরাবাই হচ্ছে প্রচলিত সুদ প্রথার ইসলামি বিকল্প যা মহানবি সা.-এর যুগে থেকে এ পর্যন্ত স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে এগিয়ে চলছে। এতেই নিহিত রয়েছে অর্থনৈতিক ভারসাম্য ও উদ্দীপনার মতো গুনাবলী। এক্ষেত্রে তিনি বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিপ্রেক্ষিতগুলোও তুলে ধরেন। প্রধান তিনটি বাংলাদেশি ইসলামি ব্যাংক তথা ইসলামি, সোস্যাল ইসলামি এবং আল আরাফা ইসলামি ব্যাংকসমূহের মুদারাবা হিসাবসমূহের বর্ণনা তুলে ধরেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি আবহমানকাল থেকে চলে আসা ইসলামি অর্থনীতির পরিভাষাগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন। যা আমি মনে করি ইসলামি ব্যাংকে চাকরি প্রত্যাশি আদর্শ যুবসমাজের জন্য অত্যন্ত উপাদেয়। প্রতিটি পরিভাষার উপশাখাগুলো নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। এ গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষাগুলোর নতুন পুরাতন উভয় পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে তিনি দলিল ভিত্তিক আলোচনা করেন। যেমন আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রে বাই সালাম এর বাস্তবায়ন। এ অধ্যায়টি বিভিন্ন বিষয়ে আধুনিক ফকিহদের অভিমতগুলো তুলে ধরেন। শুধু তাই নয় আল মুশারাকা আল মুতানাকিসার ক্ষেত্রে ও ওআইসি'র ফিকাহ একাডেমির সিদ্ধান্ত বর্ণনা করেন। তবে ইতোমধ্যে সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি-না তা আশা করি লেখক দ্বিতীয় সংস্করণে তুলে ধরবেন। বিভিন্ন প্রাঞ্জল উদাহরণের মাধ্যমে জটিল অনেক পরিভাষা তিনি সম্পূর্ণ বোধগম্য করে পেশ করেছেন। যেমন: একটি গাড়িকে কেন্দ্র করে ইজারা চুক্তির আলোচনা। দলিল ও যুক্তিভিত্তিক আলোচনা দ্বারা তিনি এটাই প্রমাণ করেন যে ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থায় অনুসৃত সকল বিনিয়োগ পদ্ধতি শরিয়াহর আলোকে বৈধ। এখানে প্রশ্ন তোলার কোনো অবকাশ নেই।

চতুর্থ অধ্যায়ে তিনি প্রচলিত কিছু আয়েরখাত ইসলামি ব্যাংকিং পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে আলোচনা করেন। এর অধিকাংশ প্রাত্যহিক লেনদেন সংক্রান্ত তাই অতি প্রয়োজনীয়। যেমন: বৈদেশিক মুদ্রা, বেচাকেনা, এলসি, এটিএম কার্ড, লকার

ভাড়া আরো অনেক বিষয়। এখানেও তিনি কুরআন-হাদিসভিত্তিক আলোচনা করে ফিকহি গভীরতার পরিচয় দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে আধুনিক ফিকহের এর অগ্রপথিক শায়েখ অতিয়া সাকারের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

পরিশেষে তিনি এটাই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন যে ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থা গোটা মানবজাতির জন্য বড় রহমত কেননা তা সুদের মতো এক মারাত্মক গুনাহ থেকে রক্ষা করতে সদা সক্রিয়। এ ব্যবস্থার আদর্শে উৎসাহিত হয়ে সুদি ব্যাংকগুলো ও ইসলামি ব্যাংকে রূপান্তরিত হচ্ছে যা ধীরে ধীরে বৈশ্বিক প্রপঞ্চে পরিণত হচ্ছে ।

শাহেদ হারুন
প্রভাষক, ইসলামিক ইউনির্ভাসিটি অব টেকনোলজি, বাংলাদেশ
E-mail: shahedharun@gmail.com

সুন্নাহ্‌র আইনগত মর্যাদা

লেখক: জাস্টিস মুহাম্মদ তাকি ওসমানি, অনুবাদ: প্রফেসর ড. রহমান হাবিব, প্রকাশক: বাংলাদেশ ইনিস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি), প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ২০১৪, আইএসবিএন: ৯৮৪-৭০১০৩-০০২৫-৩, পৃষ্ঠা: ৯৮

সুন্নাহ্‌র আইনগত মর্যাদা ও মানদণ্ড সম্পর্কে তথ্যমূলক একটি গ্রন্থ ইংরেজি ভাষায় লেখার প্রয়োজনীয়তা অনেক দিন থেকে লেখক অনুভব করছিলেন। এ গ্রন্থটি মূলত: সেই প্রচেষ্টারই ফসল।

ইসলামি আইনের উৎস হিসেবে সুন্নাহ্‌র প্রকৃত মর্যাদা সম্পর্কে যথাযথ উপলব্ধি আনয়ণের লক্ষ্যে লেখক তাঁর এ উপস্থাপনায় বলেন, "এ গ্রন্থটি সেই সকল সাধারণ পাঠকদের জন্য যারা হযরত মুহাম্মাদ সা.-এর সুন্নাহ্ কি তা জানতে চায় এবং কিভাবে অনাগত মুসলমানদের জন্য সুন্নাহ্ অত্যাবশ্যকীয় -এর যথাযথ কারণ খুঁজতে চায়। পবিত্র কুরআন সুন্নাহ্‌কে কি মর্যাদা দিয়েছে এবং অতীতের মুসলিম সম্প্রদায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কিভাবে এ সুন্নাহ্ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে তাও এ গ্রন্থতে পাওয়া যাবে"। উপরোক্ত বিষয়ের আলোকে লেখক নিম্নোক্ত আলোচনার প্রয়াস পেয়েছেন-

প্রথম অধ্যায়ে লেখক সুন্নাহ্‌র পরিচয়, নবি সা.-এর মর্যাদা এবং তাঁকে যে চারটি দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে সে সম্পর্কে চমৎকার উপস্থাপন করেছেন। এতে রসুল সা.-এর আনুগত্য ও অনুসরণ বিষয়ে পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহের উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা সত্যিই অনন্য। এক্ষেত্রে নবি সা.-এর আনুগত্যের বাধ্যবাধকতা প্রমাণে লেখক প্রায় ৩০টি আয়াত উপস্থাপন করেছেন। এতদ্ব্যতিত তাঁর অনুসরণের বাধ্যবাধকতা প্রমাণে প্রায় ১৫টি আয়াত উল্লেখ করেছেন যা পাঠক এবং গবেষকদের চিন্তার দ্বার নতুনভাবে উন্মোচিত করবে। রসুল সা. মানবজাতির জন্য দুই ধরনের প্রত্যাদেশ রেখে গেছেন। ১. ওহি মাতলু তথা কুরআন আর; ২. ওহি গায়রে মাতলু তথা আস্ সুন্নাহ্। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রকারটি হলো প্রথমটির জীবন ভাষ্য, যা ছাড়া প্রথমটির মর্মার্থ বুঝার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির অবকাশ রয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রেই। দ্বিতীয় ধরনের ওহি তথা গায়রে মাতলু যে কুরআন দ্বারা প্রামাণিত সে বিষয়ে লেখকের ক্ষুরধার উপস্থাপনে করেছেন যেকোনো গবেষক-পাঠক তাতে সত্যিই মুগ্ধ হবেন এবং চিন্তার খোরাক পাবেন। যেমন: ক্বিবলা পরিবর্তন, রমাজান মাসে রাতে স্ত্রী সম্ভোগ, বদর যুদ্ধে ফিরিশতা পাঠায়ে সাহায্যের প্রতিশ্রুতির কথা, বদর যুদ্ধে যেকোনো একদলের ওপর মুসলমানদের বিজয়ী হওয়ার নিশ্চয়তার কথা, রসুল সা.-এর এক স্ত্রীর নিকট বর্ণিত গোপন কথা প্রকাশের খবর, বনু নজিরের দূর্গের গাছ কাটা, রসুল সা.-এর পালক পুত্র যায়েদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে রসুল সা.-

এর বিবাহের বিষয়, সালাত কায়েম পদ্ধতির প্রায়োগিক বাস্তবায়ন, খায়বারের যুদ্ধে মুনাফিকদের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত ঘটনা, কুরআনের আয়াত নাজিল হওয়া মাত্রই রসুল সা.-এর তা মুখস্ত করার প্রচেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত হওয়া, কিতাবের সাথে জ্ঞান নাজিল করা ইত্যাকার ইস্যুতে প্রায় ১৬টি আয়াত উল্লেখ করে লেখক প্রমাণ করেছেন যে, এ আয়াতগুলো ওহি গায়রে মাতলু বা অ-আবৃতিকৃত ওহি বা সুন্নাহ্কে শুধু নিশ্চিতই করে না; বরং এটির নির্ভরযোগ্যতা ও প্রামাণিকতাকেও নির্দেশ করে।

অধ্যায়ের শেষ প্রান্তে লেখক 'একজন প্রশাসক থেকে একজন নবির আনুগত্যের স্বাতন্ত্র' শিরোনামে অত্যন্ত প্রাঞ্জল যুক্তি ও দলিলাদি উপস্থাপন করে বলেন, "প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, রসুল সা.-এর প্রতি আনুগত্য আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত অপঠিত (হাদিস) ওহি'র মাধ্যমে প্রমাণযোগ্যতা লাভ করেছে। সেজন্যই নবি সা.-এর আনুগত্য করাকে আল্লাহ্ তায়ালা যেন নিজের প্রতি আনুগত্য হিসেবেই গণ্য করেছেন। অন্যপক্ষে কোনো শাসক বা রাষ্ট্রপ্রধান-কেউ-ই-কোনো প্রকার ওহি দাবি করতে পারে না। এটি এজন্য যে, একজন শাসক তাঁর বিষয়ের ওপর কর্তৃত্বশীলতা প্রকাশ করতে পারেন; কিন্তু শরিয়তের বিধান দিতে পারেন না। তাঁর আদেশ প্রশাসনিক আদেশ, যা নাগরিকরা মেনে চলবে। কুরআন ও সুন্নাহ্'র কোনো নীতিকে তিনি অগ্রাহ্য করতে পারেননা। শরিয়াহর আইনের মতো তাঁর দেয়া আইন নির্ভরযোগ্য গ্রহণযোগ্যতা পাবে না। কারণ সেটি ওহি বা প্রত্যাদেশের ভিত্তিতে নয়। শাসক সেখানেই তাঁর বিচক্ষণতা খাটাতে পারেন; যে বিধান সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহ্ স্পষ্টভাবে কিছু নির্দেশ দেয়নি। নবি সা.-এর বিষয়টি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। নবি সা. রসুল হিসেবে আল্লাহ্ তায়ালার কাছ থেকে পঠিত (কুরআন) ও অপঠিত (হাদিস) উভয় ওহিই লাভ করেছেন। সেজন্য তাঁর নির্দেশনা শুধু ব্যক্তি হিসেবে নয়; বরং নবি ও ব্যক্তি-উভয় হিসেবেই মান্য করতে হবে। তা ওহির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত অথবা ওহি দ্বারা নিশ্চিতভাবে সমর্থিত যাই হোক না কেন"।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইসলামি আইনের উৎস হিসেবে সুন্নাহ্ যে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তা এ অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে। এখানে লেখক 'নবি সা. কর্তৃক আইনের বিধান দেয়ার এখতিয়ার' শিরোনামে আলোচনায় প্রায় ১২টি আয়াত উপস্থাপন করে প্রমাণ করেছেন যে, মুসলমান হতে হলে নবি সা.-এর রায়ের প্রতি নিজেকে সমর্পণ করতে হবে। যারা তা করে না কুরআন অনুযায়ী এটি প্রমাণিত হয় যে, তাদেরকে অবিশ্বাসী হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। কুরআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নবি সা.-এর অধিকার শিরোনামে লেখক প্রমাণ করেছেন, সন্দেহমুক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, নবি সা.-এর প্রধান কাজ হলো কুরআন বর্ণনা করা এবং নবি সা.-এর কাছে আগত ওহিকে বিশ্লেষণ করা। নবি সা. কৃত কুরআনের ব্যাখ্যা শিরোনামে আলোচনায় লেখক প্রায় ১০টি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন যা গবেষক- পাঠকের জন্য দলিল প্রমাণ অন্বেষণে সহায়ক হবে এবং তাদের চিন্তার খোরাক যোগাবে।

এ অধ্যায়ের শেষ প্রান্তে এসে লেখক পাঠকের চিন্তাজগতে আঘাত করেছেন এভাবে- প্রথম অধ্যায়ে অনেক যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করা হয়েছে যে, আল্লাহ কোনো নবি ব্যতিত কোনো আসমানি কিতাব নাজিল করেননি। আল্লাহ তায়ালা এও স্পষ্ট করেছেন যে, নবিগণ প্রেরিত হয়েছেন আসমানি কিতাব শিক্ষা দেয়া ও ব্যাখ্যা করার জন্যে। আমরা এটাও প্রমাণ করেছি যে, নবি সা.-এর সুন্নাহ্'র সাহায্য ব্যতিত এমনকি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কিভাবে সঠিকভাবে পড়া যাবে তাও আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হতো না। তিনি আরো উল্লেখ করেন, উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্তে আমরা উপণীত হই যে, নবি সা.-এর সুন্নাহ্ ইসলামি আইনের দ্বিতীয় উৎস। নবি সা. হিসেবে তিনি যা বলেছেন, তা পালন করা উম্মতের জন্য বাধ্যতামূলক। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নবি সা. যে ওহি লাভ করেছেন, তার ভিত্তিতে সুন্নাহ্ প্রতিষ্ঠিত। কুরআনের আয়াতের ভিত্তিতে যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেগুলোকে তো বাদ দেয়া যাবে না; অধিকন্তু সেগুলোর অধিকার ও কর্তৃত্বকেও ছাটাই করা যাবে না।

তৃতীয় অধ্যায়ে সুন্নাহ্‌র প্রামাণিকতায় যে সকল প্রমাণাদি অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য ও প্রাঞ্জলভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে তা সত্যিই মনোমুগ্ধকর। ইদানিং সুন্নাহ্ বা হাদিসের প্রামাণ্যতার বিষয়ে সন্দেহপোষণকারী এবং ক্ষেত্রবিশেষে অস্বীকারকারীর সংখ্যা আশংকাজনক হারে বেড়ে যাচ্ছে। তারা নবি সা.-এর সুন্নাহ্ গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম। সুন্নাহ্‌র অনন্য সাধারণ যুক্তি ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণে তাদের কেউ কেউ সুন্নাহ্‌র ঐতিহাসিক প্রামাণিকতার ব্যাপারে সন্দেহপরায়ণ হতে চায়। তাদের মতে "সুন্নাহ্‌র উপযোগিতা অনাগত সময়ের জন্য প্রযোজ্য আর এ সুন্নাহ্‌র সংরক্ষণের ব্যাপারে বিশ্বাসযোগ্য কোনো পদ্ধতিও তেমনভাবে গৃহিত হয়নি। কুরআন বাদে একটিও গ্রন্থ নেই যেখানে নির্ভরযোগ্য সব হাদিসের সমাবেশ ঘটেছে। এমন অনেক হাদিস আছে যেগুলো একটির সাথে আরেকটি সাংঘর্ষিক এবং সেই হাদিসের কিতাবগুলো হিজরি তৃতীয় শতকে সংকলিত হয়েছিল। যেজন্য হিজরি প্রথম তিন শতাব্দীর প্রতিবেদনগুলোর ওপর তারা বিশ্বাস রাখতে পারছে না"।

লেখক অতি চমৎকারভাবে তাদের উপর্যুক্ত ভ্রান্ত তথ্য-নির্ভর বিশ্বাস ও যুক্তির অপনোদন করেছেন এ অধ্যায়ে। তিনি অত্যন্ত বলিষ্ঠ তথ্য-নির্ভর প্রমাণ পেশ করেছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি বলেছেন "হিজরি তৃতীয় শতকে হাদিস সংকলিত হয়েছে"- এই দাবিটিই ভুল। এতদুদ্দেশ্যে সুন্নাহ্‌র সংরক্ষণ বিষয়ে গৃহিত পদ্ধতি তথা (ক) স্মৃতিতে সংরক্ষণ, (খ) আলোচনা, (গ) ব্যক্তিগত জীবনে হাদিসের প্রয়োগ এবং (ঘ) লেখনী - ইত্যাকার বিষয়ে অকাট্য প্রমাণসমূহ উপস্থাপন করেছেন। বিশেষত সুন্নাহ্ লিখে রাখার বিষয়ে রসুল সা.-এর নির্দেশ সংবলিত সাতটি উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন। এগুলোর অধ্যয়ণ ও বিশ্লেষণ যেকোনো পাঠকের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ আলোকবর্তিকার ভূমিকা রাখতে পারবে। এছাড়া সাহাবি রা.-এর সংকলিত হাদিস-এর আলোচনায় তিনি আবু হুরায়ারা রা., আলী রা., জাবির রা. এবং ইবনে আবাস রা. প্রমুখের পাণ্ডুলিপিসমূহের উল্লেখপূর্বক প্রমাণের পক্ষে পাহাড়সম শক্ত ভিত্তি দাঁড় করেছেন। সাহাবা রা.-এর পরবর্তী সময়ের সংকলনের বিষয়ে প্রথম শতাব্দীর সংকলিত প্রায় ১৯টি গ্রন্থের তালিকা এবং দ্বিতীয় শতাব্দীতে সংকলিত গ্রন্থসমূহের ৪০টির তালিকা উপস্থাপন করে বলেন এ তালিকাটি কোনোভাবেই আসলে পূর্ণাঙ্গ তালিকা নয়। আজও এ সংক্রান্ত যে সমস্ত গ্রন্থ ছাপা অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে, তা দেখে এটি স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এ গ্রন্থসমূহের শৈলী খুবই উন্নত ছিলো এবং এগুলো এ বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ অবশ্যই নয়। সব গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলি ও প্রচেষ্টাসমূহ শুধু প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর হাদিস সংকলন সংক্রান্ত; যারা বলে যে, তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বে হাদিসের কোনো সংকলন ছিল না তারা যে কত মিথ্যা তথ্য দিয়েছে তা এখানে প্রমাণিত হয়েছে।

গ্রন্থটির এ সংস্করণে সামান্য মুদ্রণ সংশ্লিষ্ট ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে। একাধিক স্থানে 'স্বর্গীয়' জাতীয় কয়েকটি শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। কোনো কোনো পাঠকের দৃষ্টিতে এগুলোকে খানিকটা মুসলিম সংস্কৃতির বিপরীত মনে হতে পারে। সম্ভবত: এগুলো অনুবাদকের নিজস্ব প্রয়োগ করা শব্দ। পরবর্তী সংস্করণে প্রকাশনা সংস্থা এদিকে খেয়াল রাখবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আশা করি। গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করছি, সেই সাথে সমগ্র মুসলিম সমাজে উদ্ভূত হাদিস ও সুন্নাহ্ সম্পর্কে নবসৃষ্ট বিভ্রান্তির অবসান হবে বলে বিশ্বাস করি।

মো. আইউব হোসেন
ডেপুটি রেজিস্ট্রার, কারিকুলাম উন্নয়ন ও মূল্যায়ন কেন্দ্র,
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।
E-mail: mdayubh@yahoo.com

সৃজনশীল চিন্তা: ইসলামি পরিপ্রেক্ষিত

লেখক: জামাল বাদি ও মুস্তাফা তাজদিন, অনুবাদ: প্রফেসর মুহাম্মদ হাসানুজ্জামান, প্রকাশক: বিআইআইটি, প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ২০১৪, আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৮৪৭১-৩২-৬, পৃষ্ঠা: ২৭৪

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া'র অধ্যাপক ড. জামাল বাদি ও ড. মুস্তাফা তাজদিনের Creative Thinking: An Islamic Perspective একটি অনন্য সাধারণ গ্রন্থ যা বাংলায় 'সৃজনশীল চিন্তা: ইসলামি পরিপ্রেক্ষিত' শিরোনামে বিআইআইটি, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

সৃজনশীলতা হচ্ছে মনের এমন এক অবস্থা যা শৃঙ্খলার সীমানা অতিক্রম করে থাকে অর্থাৎ এটা এমন এক অবিভাজ্য সত্তা যা মানুষের মনকে সুনির্দিষ্ট উদ্ভাবন ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু-বহির্ভূত উদ্ভাবনে সমর্থ করে থাকে। নতুন প্যাটার্ন অবলম্বনে প্রশিক্ষণ ও চিন্তন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে তা বিকাশে সমর্থ হতে পারে।

আলোচ্য গ্রন্থটি সৃজনশীল চিন্তা বিষয়ে ভূমিকাস্বরূপ হলেও এর বিষয়সূচির একটি বড় অংশ সমালোচনামূলক চিন্তার বিষয়াদি নিয়ে গড়ে উঠেছে। লেখকদ্বয়ের মতে এটা এজন্য যে, চিন্তার সৃষ্টি ও সমালোচনাধর্মী প্রক্রিয়া অবিচ্ছিন্ন এবং এর একটি অন্যটির পরিপূরক। তাদের মতে, সমালোচনামূলক ও সৃজনী চিন্তা উভয়েই একটি সংহত পদ্ধতিতে উপস্থাপিত হওয়া উচিত।

একটি পূর্ণাঙ্গজীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম যুগ ও কালের গন্ডি পেরিয়ে অসীমতায় সমৃদ্ধ। কিন্তু প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থার সাথে ইসলামকে কী নতুন করে খাপ খাইয়ে চলতে হবে, না সূচনালগ্ন হতেই ইসলাম সকল পরিবর্তন ও বিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যশীলতা ধারণ করেই যাত্রা শুরু করেছে - তা হৃদয়ঙ্গম করতে চিন্তার ক্ষেত্রে সৃজনশীলতার কোনো বিকল্প নেই। আর এ গ্রন্থটি ইসলামি পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে এ ইস্যুকে প্রাসঙ্গিক করে তোলো। এ গ্রন্থটিতে মোট আটটি অধ্যায় আছে।

প্রথম অধ্যায়টি ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে তাফাককুর বা চিন্তা বিষয়ক। যেখানে চিন্তার সাধারণ ধারণা, কুরআনে 'চিন্তা' ধারণার নির্দেশাবলী সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ, ইসলামে 'চিন্তার' মর্যাদা, অবস্থান ও উদ্দেশ্যাবলী, চিন্তায় বিঘ্ন সৃষ্টিকারী অন্তরায়সমূহ, চিন্তাকে উৎসাহিতকরণে ইসলামের ভূমিকা এবং ইজতিহাদের প্রধান উপাদান হিসেবে চিন্তা- এ বিষয়বস্তুগুলো সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় কুরআনে বর্ণিত চিন্তার বিভিন্ন ধারা নিয়ে আবর্তিত। কুরআন মজিদ আল্লাহ তায়ালার বাণী, যা তাঁর শেষ নবি মুহাম্মদ সা.-এর উপর প্রত্যাদিষ্ট হয়েছিল সমুদয় মানবজাতিকে জানাতে ও যোগাযোগ করতে। এটা দেখে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, কুরআনে 'চিন্তার' বিভিন্ন প্রকার স্টাইল ব্যবহৃত হয়েছে। প্রতিটি স্টাইল বা ধরণ নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণে সতর্কতা ও কার্যকারিতার সাথে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহর বাণীকে ভালোভাবে বুঝা ও পৃথিবীতে কল্যাণময় জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে চিন্তার এসব ধরণকে মানব-উপলব্ধির পরিধি বিস্তৃততর করতে ব্যবহার করা হয়েছে। লোকদের বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রাধিকারের ভিন্নতাকে সামনে রেখে এগুলোকে বাণী পৌঁছাবার উপকরণ হিসেবেও গ্রহণ করা যেতে পারে। এতে কৌতুহলী (Inquisitive), উদ্দেশ্যমূলক (Objective), ইতিবাচক (Positive), প্রকল্পিত (Hypothetical), যৌক্তিক (Rational), প্রতিক্ষেপনকারী/ধ্যানাভিমুখী (Reflective/ Contemplative), মানসগোচর (Visual), রূপকাশ্রিত (Metaphorical), সাদৃশ্যমূলক (Analogical), আবেগপূর্ণ (Emotional), প্রত্যক্ষ (Perceptual), ধারণাগত (Conceptual), ইন্দ্রিয় (Intuitive), বিজ্ঞানসম্মত (Scientific) এবং

আকাঙ্ক্ষা/অভিলাষপূর্ণ (Wishful) এরূপ চিন্তার পদ্ধতি সংক্রান্ত সমকালীন পনেরটি চিন্তাশৈলী (Thinking Style) আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে আগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ইজতিহাদকে চিন্তার একটি সৃজনশীল হাতিয়ার হিসেবে আলোচনার পাশাপাশি ইসলামে সৃজনশীল ইজতিহাদের সাধারণ অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিধিমালা উল্লেখ করা হয়েছে।

ইসলামি বিজ্ঞান কী হতে পারে? হুদভয় (Hoodbhoy) তাঁর 'ইসলাম ও বিজ্ঞান' গ্রন্থে এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই মূলত: চতুর্থ অধ্যায়ের অবতারণা। এখানে বস্তুত মানবিয় জ্ঞান তথা যুক্তিবিদ্যায়, গণিত, জ্যোতি ও পদার্থবিদ্যায়, আলোক, চিকিৎসা, রসায়ন ও সমাজবিদ্যায় এবং ইতিহাসের দর্শন বিষয়ে মুসলিম পণ্ডিতের অবদান বর্ণিত হয়েছে। সৃজনশীলতা অর্জন করা যে কোনো বিশেষ সংস্কৃতি বা গোষ্ঠীর একচেটিয়া অধিকার নয় পাঠকের মনে এ উপলব্ধি সঞ্চারিত করাই হচ্ছে এ অধ্যায়ের লক্ষ্য।

পঞ্চম অধ্যায় সৃজনশীলতাকে একজন পাঠকের নিকট পাশ্চাত্য প্রেক্ষাপটে তুলে ধরবে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সৃজনশীলতার ঐতিহাসিক পরিক্রমা, এর সংজ্ঞা ও উপাদানসমূহ, সৃজনশীলতা অধ্যয়নে পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি, সৃজনশীলতা বিষয়ক গবেষণাকর্ম মূল্যায়ন তথা পশ্চিমা জগতে প্রচলিত সৃষ্টিশীলতা সংক্রান্ত প্রধান বক্তব্যসমূহকে উপস্থাপন করা।

ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে সমালোচনাধর্মী চিন্তাধারার অন্তবর্তী ইস্যুগুলোকে বিস্তৃত করা হয়েছে। ভাষা ও উপলব্ধিকে চিন্তার শৈল্পিকতার মধ্য দিয়ে এবং বিভিন্ন যুক্তিতর্ক কিভাবে পরিমাপ করতে হয় সে পদ্ধতির সাথে পাঠককে পরিচিত করার উদ্যোগ রয়েছে। শেষে সহায়ক গ্রন্থাবলির একটি সমৃদ্ধ তালিকা যা গ্রন্থটির গ্রহণযোগ্যতাকে আরো কয়েকগুণ বাড়িয়ে তুলবে নিঃসন্দেহ।

পরিশেষে বলা যায় যে, সৃজনশীলতা অভ্যন্তরীণ গুনাবলি নয় বরং দক্ষতা সংশ্লিষ্ট। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে যে পরিবর্তনের দামামা বেজে উঠেছে তাতে চালকের আসনে বসতে হলে সৃজনশীলতাকে স্বযত্নে লালন করা এবং আগামী প্রজন্মের মন মগজে তা প্রোথিত করা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। এ বাস্তব পটভূমিতে এ গ্রন্থটি পাঠক মানসে এক নবজাগৃতির সূচনা করতে পারবে অনায়াসে।

মূদ্রণজনিত কিছু প্রমাদ পরিলক্ষিত হলেও বিষয়বস্তু বিবেচনায় এ গ্রন্থটি পাঠকবৃন্দের নিকট বেশ সারা জাগাবে। ফলে সর্বাধিক বিক্রিত গ্রন্থের তালিকায় এটি সহজেই স্থান করে নিতে সক্ষম হবে আশা করা যায়। পরবর্তী সংস্করণে সংশ্লিষ্ট প্রকাশক বিদ্যমান প্রমাদসমূহ দূরপূর্বক গ্রন্থটিকে আরো পরিশিলিতভাবে উপস্থাপনে প্রয়াসী হবেন। পরিশেষে আমি মনে করি, এটি ছাত্র-শিক্ষক-লেখক-গবেষক নির্বিশেষে সকলের অবশ্য পাঠ্য একটি গ্রন্থ।

মাহফুজার রহমান
সহকারী পরিচালক, গবেষণা ও প্রকাশনা
বিআইআইটি, ঢাকা
E-mail: rahmanru_pops@yahoo.com